জুলাই-আগস্ট, ১৯৮১ ॥ পঞ্চাশ পয়সা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে তথ্য, বিশ্লেষণ, আলোচনা

হোমিওপ্যাথি কতখানি বিজ্ঞানসম্মত

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

গবেষণাগার না কি পুলিশ ব্যারাক :
ইণ্টারভিউ

ক্যানসার প্রসঙ্গে বিতর্ক

পরিচ্ছন্ন বোমা

কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক টিকে

আবহাওয়া দূষণ : শুধু শহরেই নয়

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত। পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জুলাই-আগস্ট, ১৯৮১

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচী

মুখবন্ধ ১

পত্রিকা সম্পর্কে পাঠক ১

হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ?—
মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ও দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী ২

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)—পার্থ সেন ৫

ক্যানসারের কারণ কি ? একটি বিতর্ক—
নিজস্ব প্রতিবেদক ৮

জানবার কথা—ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ কঠিন কেন ? ৮

PRL—গবেষণাগার না কি পুলিশ ব্যারাক :—
একটি সাক্ষাৎকার ৯

পরিচ্ছন্ন মারণবোমা—অভিজিৎ লাহিড়ী ১২

কার্টুন—সৌমেন গুহ ১৩

পরিক্রমা— সন্ধানী ১৪

ডাক্তারবাবু কোথায় ?

ক্যানসার ও সিকাফেক

কে বলে এদেশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ নেই !

ম্যালেরিয়া বাড়ছে

কুষ্ঠ রোগের সম্ভাব্য প্রতিষেধক টিকে

শিল্পাঞ্চলের আবর্জনা গ্রামের আবহাওয়া
দূষিত করছে

চিঠিপত্র ১৫

পর্যালোচনা : পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়—
মোহনলাল চ্যাটার্জী ১৬

রিপোর্ট : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার
বার্ষিক সাধারণ সভা ১৭

গত চার বছরের বিষয় সূচী ১৮

ত্রুটি স্বীকার

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' মে-জুন ১৯৮১ সংখ্যায় 'জীবনালেখ্য : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য' ও 'বিজ্ঞান পদ-যাত্রা : একটি অভিজ্ঞতা' এই লেখা দুটির লেখক ছিলেন যথাক্রমে সৌমেন গুহ ও রবীন চক্রবর্তী। ভুলবশত নাম দুটি বাদ পড়ায় আমরা দুঃখিত।

লেখা চাই

লেখা পাঠান—বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী, লোকবিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সম্ভাবনা ও সামাজিক তাৎপর্য, প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ, ইতিহাসে বিজ্ঞান, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক লেখা। চাই নতুন ভাবনার দিশারী তথ্যসমৃদ্ধ সমীক্ষা ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। কলকাতা থেকে দূরে যাঁরা আছেন তাঁদের ভাবনা নিয়ে আমরা সমৃদ্ধ হতে চাই।

এই ঠিকানায় পাঠান :

১নং কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৯

গ্রাহকদের প্রতি

গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক তিন টাকা (সডাক)

এজেন্টদের কমিশন ২৫%.

যোগাযোগের ঠিকানা :

(১) c/o ডি. এস. এন্টারপ্রাইজ, ৫২।৯ সি, বি, বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২ (প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়)

(২) ১, কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ (প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়)

সর্বসাধারণের প্রতি

পড়ুন এবং পড়ান

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

উৎস মানুষ

প্রতি সংখ্যা ১ টাকা ; বার্ষিক সডাক ১২ টাকা

ঠিকানা : বি. ডি. ৪৯৪, সল্ট লেক
কলি : ৭০০০৬৪

শিল্পনগরী কল্যাণী এবং নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের মানুষ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পাক্ষিক পত্রিকা।

প্রগতি বার্তা

দাম পঁচিশ পয়সা / বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ছ' টাকা

ঠিকানা : বি. ৬/১১৯ কল্যাণী
নদীয়া ৭৪১২৩৫

মুখবন্ধ

চার পেরিয়ে পাঁচে পা দিল 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'। সময়ের হিসেবে বয়স খুব একটা কম নয়, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই বলছেন, বিশেষ কোন ছাপ ফেলতে পারছে না 'বি-ও-বি'। পত্রিকার আঙ্গিক সৌষ্ঠব উল্লেখযোগ্য নয় এটা হয়ত একটা কারণ। কিন্তু ভিতরকার মাল-মশলাও পাঠকের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারছে না একথাও মনে হচ্ছে অনেকের। যাঁরা পত্রিকা ধৈর্য ধরে পড়েন তাঁদের অনেকেই বলেন যে না, রচনাগুলি বেশ সুচিন্তিত বিশ্লেষণধর্মী। কিন্তু যাঁরা পড়েন তাঁদের সংখ্যা, স্বীকার করতেই হবে, অত্যন্ত কম। তাহলে করণীয় কি? পাঠকদেরকে প্রশ্ন করে বা কথাবার্তা বলে তাঁদের মনোভাব বুঝতে গিয়ে নির্দিষ্ট কোন দিশা এখনো পাওয়া যায়নি। পাঠকদের মতামতের কিছু নমুনা এ সংখ্যায় দেওয়া হল, পরেও দেওয়া হবে। সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃ-সম্পর্ক, বা বিজ্ঞানের সামাজিক তাৎপর্য, এটাই পত্রিকার কেন্দ্রীয় বিষয় থাকছে। তবে রচনাগুলিকে আরো সহজপাচ্য ও বহুমুখী করার চেষ্টা থাকবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য রচনাগুলির মধ্যে বা আলাদা করে পরিবেশন করা হবে আরো বেশী মাত্রায়। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য বা বক্তব্য রাখার উপর জোর দেওয়া হবে আরো বেশী। অবয়বও বদলানো হচ্ছে।

দেখা যাক, পাঠক সাধারণের কাছে এভাবে পত্রিকা আরো গ্রহণীয় হয় কিনা, তাঁরা একে নিজের করে নেন কি না, এতে আরো সক্রিয় ভূমিকা নেন কি না।

আর যদি তাঁরা মনে করেন যে না, পত্রিকা এখনো ঠিক দিকে চলছে না, তবে কি ধরনের পরিবর্তন বা প্রচেষ্টা প্রয়োজন সেটা দ্বিধাহীনভাবে জোর গলায় জানাবেন, এটুকু 'বি-ও-বি'র অনুরোধ নয়, দাবী।

এই সংখ্যার বিষয়সূচী শুনে অনেকে জিজ্ঞাসা করলেন স্বাস্থ্য বা ডাক্তারী বিষয় সংক্রান্ত এত টপিকের ছড়াছড়ি কেন? এর উত্তর, কোন বিশেষ পরিকল্পনার দরুণ এটা ঘটে নি, এমনিই হয়ে গেছে।

পত্রিকা সম্পর্কে পাঠক

আমাদের পত্রিকা সম্পর্কে মতামত জানতে দু'একজন পাঠকের সাথে আলোচনা করেছিলাম। তার থেকে দু'একটি বক্তব্য খুব সংক্ষেপে হাজির করছি। জানতে যা চেয়েছি তা অনেকটা এই ধরনের, যেমন, পত্রিকাটি কেমন লাগে, বিশেষ কোন বিষয় বা প্রবন্ধ ভাল লেগেছিল বলে স্মরণ করতে পারছেন কিনা, কি ধরনের লেখা বেশী করে থাকা উচিত, 'পপুলার সায়েন্স' ধরনের কিছু আমাদের পত্রিকার বিষয়ান্তর্ভূত করা যায় কিনা, ইত্যাদি।

লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা (ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কঃ বিঃ)

পড়তে খুব খারাপ লাগে না। বিশেষ কোন প্রবন্ধর কথা এক্ষুনি মনে পড়ছে না। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আরও অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা থাকলে ভাল হয়। 'পপুলার সায়েন্স' ঘেঁষা লেখা পত্রিকার প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

সুব্রত ভট্টাচার্য (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্ট্রিটিউট)

খুব ভালো লাগে তা নয়। পত্রিকার মূল কেন্দ্রবিন্দু সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়েই হওয়া উচিত। 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান'এর ওপর এখুনিই জোর দেবার কোন প্রয়োজন নেই কারণ কয়েকটি পত্রপত্রিকা ইতিমধ্যে এই উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, 'উৎস মানুষ')

বেশ কিছুদিন যাবৎ দেখছি পত্রিকাটি। অধিকাংশ লেখা বেশ মাথা খাটিয়ে পড়তে হয়। সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলি থেকে "মাইক্রো-নেশিয়া: নয়া হিরোশিমা-নাগাসাকি" ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের কথা স্মরণে আসছে না। সরকারী বিজ্ঞাননীতির সমালোচনা বিষয়ক লেখাগুলো মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে মূল্যবান বটে, তবে সাধারণ মানুষের কাছে কোন আবেদন আছে বলে মনে হয় না। আর বেশীর ভাগ লেখাই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চিন্তা-ভাবনা ও জীবনবোধ থেকে বেশ দূরের বলেই মনে হয়—অন্তত আপাতত যা দেখছি।

হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ?

[A general appraisal of the theory and practice of the Homeopathic system of treatment is outlined in the present article by a non-medical scientific worker. Hahnemann's Homeopathy, according to him, smacks of mysticism which militates against the spirit of modern science. The author finds the homeopathic system of medicine hardly justifiable from the stand-point of modern science. The present boom in the cult of homeopathy seems due partly to the moribund social mood and the underdeveloped socio-economic conditions of present-day India and partly to the opportunistic patronage provided by the Government.]

চিকিৎসা বিদ্যা সুপ্রাচীন, তবে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়, বিশেষ করে রসায়নে বেশ কিছুটা উন্নতি ঘটার পরেই গড়ে ওঠে সুশৃঙ্খল চিকিৎসা-বিজ্ঞান। প্রধানতঃ লুই পাস্তুরের (১৮২২-১৮৯৫) জীবাণু-তত্ত্ব আবিষ্কারের পরেই এই রূপান্তর বেগবান হয়। অগ্রগতির পথে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে নাকচ হয়ে গেছে বহু পুরানো ধারণা। চলে গেছে মন্ত্র-তন্ত্র, যাদু-ভেল্‌কির যুগ। এমন কি হোমিওপ্যাথি-এ্যালো-প্যাথিও প্রমাণের অভাবে প্রায় নাকচ।

হোমিওপ্যাথি ও হ্যানিম্যান

প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাবিদ্ হিপোক্রেটিসের (৪৬০-৩৭৭/৩৫৯ খৃঃ পূঃ) মত ছিলো: অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসকের কাজ। রোমান আমলের চিকিৎসক গ্যালেনের (১৩১-২০০ খৃষ্টাব্দ) মত ছিলো উল্টো: প্রকৃতিকে জয় করাই কাজ—রোগের সাথে লড়াই করে তার বিনাশ ঘটাতে হবে। গ্যালেনের শিষ্যরা গড়ে তুললেন এ্যালোপ্যাথি ব্যবস্থা ('এ্যালো'র অর্থ ভিন্ন বা উল্টো; গ্রীক 'পেথস্' অর্থে দুঃখ, কষ্ট থেকে 'প্যাথি')। কালে, এই ব্যবস্থা বীভৎস রূপ ধরলো: প্রচুর রক্ত বার করা; কথায় কথায় কোষ্ঠ শোধন; কড়া কড়া, প্রায় বিষাক্ত ভেষজ প্রয়োগ; জোর করে বমি করানো। লিডেনের চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক হারম্যান বোরহাভ (১৬৬৮-১৭৩৮ খৃঃ) বলতে বাধ্য হলেন যে, একেবারে কোনো চিকিৎসক না থাকলেই মানব সমাজের কল্যাণ হতো!

এমন যুগে হ্যানিম্যান (১০ এপ্রিল, ১৭৫৫—২রা জুলাই ১৮৪৩) হোমিওপ্যাথি শুরু করলেন ('হোমো' 'হোমিও'র অর্থ সদৃশ, like, similar)। তিনিই সনাতনী চিকিৎসার নাম দিলেন 'এ্যালোপ্যাথি'।

পূর্ব জার্মানির স্যাক্সনি প্রদেশের মেইসেনে হ্যানিম্যানের জন্ম। তিনি এরলানগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. পাশ চিকিৎসক। জার্মান ভাষায় উইলিয়াম কুলেনের 'মেটেরিয়া মেডিকা' অনুবাদ করার সময় হ্যানিম্যান জানতে পারেন যে, পেরুদেশীয় যে সিঙ্কোনা গাছের ছাল দিয়ে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা হয়, সেই ছালই কোনো সুস্থ লোককে খাওয়ালে তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। নিজে খেয়েও তিনি নিশ্চিত হন এ ব্যাপারে। এর পর ছ বছর ধরে বিভিন্ন ওষুধ ও ভেষজের প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি তিনি নিজের, সুস্থ বন্ধুবান্ধব ও অনুগত ছাত্রদের শরীরে লক্ষ্য করতে থাকেন।

এই সব পরীক্ষা থেকে তিনি ধারণা করেন (১৭৯৬): যে ওষুধে সুস্থ শরীরে কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই ওষুধই ঐ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। হোমিওপ্যাথির এটাই মূল নিয়ম—'সদৃশ বিধান' বা Law of Similia : Similia similibus curantus (like cures like)।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্যারাসেল্‌সাসের (১৪৯৩-১৫৪১) অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি কতগুলি অসুখের সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং রসায়নের সাথে চিকিৎসাবিদ্যার যোগ নিবিড়তর করেন। তিনিই হোমিওপ্যাথির প্রধান সূত্রের ইঙ্গিত দেন: **মানুষকে যা অসুস্থ করে, অল্প অল্প সেবনে তাই তাকে নিরাময় করে।**

হ্যানিম্যানের মতে মানুষের 'আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তি' (Spiritual life force) ব্যাহত হলে, প্রকাশ পায় রোগ লক্ষণ। তিনি সব রোগকে তিন ভাগে ভাগ করেন: তরুণ রোগ (যা হঠাৎ আক্রমণ করে), মহামারী ও পুরানো রোগ। পুরাণো রোগের আট ভাগের সাত ভাগই খোস-পাঁচড়ার রকমফের (variations of psora), এটাও তাঁর মত ছিলো।

লিপজিগে হ্যানিম্যান চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হ'ন ১৮১২ সালে। কিন্তু ১৮২১ সালেই তাঁকে লিপজিগ ছাড়তে

হয় সনাতনপন্থী চিকিৎসক ও এ্যাপোথেকারিদের (ঔষধ বিক্রেতার) তাড়নায়। ১৮৪৩ সালে প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে তিনি জীবনে প্রচুর উপার্জন করেছিলেন।

হোমিওপ্যাথির নিয়মগুলি কি যথার্থ ?

হোমিওপ্যাথির মূল দৃষ্টিকোণ সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদের (empirical)। 'সদৃশ বিধানের' কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বিশ্লেষণের তাই বিশেষ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। সিঙ্কোনার ছাল খেলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, আবার এটাই ম্যালেরিয়ার ওষুধ : তাহলে, যখন আর্সেনিক খেলে পেট ব্যথা, দাস্তবমি হয়, আর্সেনিক নিশ্চয়ই কলেরার ওষুধ। ওষুধ নির্বাচনের এই আপ্তগ্রাহ্য পদ্ধতির ফলে একদিকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত ওষুধও হোমিওপ্যাথিতে পাওয়া যায় যেমন আর্নিকা, বেলেডোনা, সিঙ্কোনা, আবার উদ্ভট ওষুধের অন্ত নেই : ল্যাক্রিমা ফিলিয়া (কাঁদুনে মেয়ের চোখের জল), অ্যাষ্টেরিয়াস রুবেন্স (গুঁড়ো করা তারা মাছ), মেফাইটীস (ভোঁদরের বিষ্ঠা), সাইমেক্স লেক্টুলারিয়াস (জ্যান্ত ছারপোকার গুঁড়ো), এ্যান্থ্রাসাইট কয়লার গুঁড়ো, ঝিনুকের খোলার গুঁড়ো, এ্যাসিডাম ইউরিকাম (মানুষ বা সাপের মূত্র)। এই ঝোঁকের মধ্যে মধ্যযুগীয় ভেষজবিদ্যা ও কিমিয়ার (alchemy) প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না কি ?

'সদৃশ বিধানের' আর এক ধরণের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগীর কয়েক ফোঁটা রক্ত 'তেজী' (পোটেন্ট) করে রোগীকে খাওয়ানো হয়। কোনো ফোঁড়া সারানোর জন্য দেওয়া হয় তারই ফোঁড়ার রস—'তেজ' বাড়িয়ে। যক্ষ্মা সারানোর জন্য রোগীর থুথু-রক্ত, আমাশা প্রতিকারে রোগীর দাস্ত ছেঁকে রোগীর ওপর প্রয়োগ করা হয়। তাহলে কি অনাক্রম্যকরণ প্রক্রিয়ার (immunisation) সাথে হোমিওপ্যাথির সাদৃশ্য আছে ? 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক : 'অনাক্রম্যকরণের অভিজ্ঞতাবাদী অনুশীলনের সঙ্গে ওপর ওপর মিল দেখা গেলেও, হোমিওপ্যাথির যথার্থতার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই'।

'তেজ' (পোটেন্সি) ব্যাপারটা কী ? হ্যানিম্যানের মতে ওষুধ যতো কম বস্তুগত (less material) হবে, ততো বেশী হবে তার ক্ষমতা। লঘুকরণ (ডাইলিউশন) করতে করতে না কি ওষুধের পদার্থ 'বিলুপ্ত' হয়ে যায়, পড়ে থাকে এক রহস্যময় রশ্মি, যা রোগ সারায়। সেন্টেসিম্যাল স্কেলে হ্যানিম্যান '৩০ ডাউলিশন' পর্যন্ত গিয়েছিলেন। গোড়ায় নেওয়া ওষুধ এই পর্যায়ে ১০৩০ গুণ কমে যায় ডেসিলিয়নথ)—বঙ্গোপসাগরে এক চামচ ওষুধ মেশানোর সামিল এই পদ্ধতি। এ ধরণের 'তেজী' ওষুধের গুণ প্রকাশ পেতে ৩০-৫০ দিন লাগতে পারে বলা হয়। জানা কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে ডাইলিউশনের এ সব গুণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

হোমিওপ্যাথিতে রোগীকে অদ্বিতীয় বলে ভাবা হয়। রোগকে প্রায় বাদ দিয়ে কেবল লক্ষণগুলিকে ধরা হয়। লক্ষণ ধরে এক রোগীর যা ওষুধ হবে, একই রোগে আক্রান্ত আর এক রোগীর ওষুধ তা না'ও হতে পারে। অবশ্য হ্যানিম্যানের এই দৃষ্টিকোণের ভালো দিক আছে। তিনি বলতে চেয়েছেন শুধু রোগ নয়, চিকিৎসা দরকার রোগীর। কিন্তু রোগ ও তার নিরাময়ের বিধিতে কোনো শৃংখলা আনার বিরোধী এই দৃষ্টিভঙ্গী চিকিৎসাকে কখনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পারে না। তাই দেখা যায় কোনো হোমিওপ্যাথ দাবি করছেন তিনি এক গ্রেন লবণ ডেসিলিয়ন ডাইলিউশন করে এক ডোজ খাইয়ে ১৩৪৯টি লক্ষণ দেখেছেন !

অবশ্য হোমিওপ্যাথির ডোজ নিয়ে বিতর্কে হ্যানিম্যানের শিষ্যরাই ভাগ হয়ে গেলেন। নব্যপন্থীরা লঘুকরণের ওপর জোর কমালেন। ৩ থেকে ৬ ডাইলিউশানের বেশী আজ প্রায় কেউই ব্যবহার করেন না। খোস-পাঁচড়া তত্ত্বও পরিত্যক্ত।

হোমিওপ্যাথি : কেন এলো আর কেন চলছে ?

ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ও নেপোলিয়নের যুদ্ধগুলির পরে বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত জার্মান সমাজ জীবনে বেশ কিছু আজগুবি তত্ত্ব গজিয়ে ওঠে। এরই একটি হোমিওপ্যাথি। এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এ্যালোপ্যাথদের নিষ্ঠুর ও উদ্ভট চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। গত শতাব্দীর শেষ দিকে হোমিওপ্যাথি জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠে বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে। তারপর পাস্তুর, লিস্টার ও অন্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারগুলির সময় থেকে এর প্রভাব কমতে থাকে।

আজ জার্মানিতে আধুনিক চিকিৎসক দশ লাখ, আর হোমিওপ্যাথ মোটে পাঁচ হাজার। মার্কিন দেশের ফিলাডেলফিয়া বা ম্যানহাটানের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি কলেজগুলি বিশুদ্ধ হোমিও বিষয়বস্তু কমিয়ে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু জিনিস পাঠ্যসূচীতে নিয়ে এসে কোনক্রমে বাঁচার চেষ্টা করছে।

আমেরিকার ন্যাশনাল সেণ্টার ফর হোমিওপ্যাথির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের হিসেব মতে বর্তমানে ওদেশে প্রায় ১০০০ জনের মত এম. ডি. ডিগ্রিধারী ডাক্তার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন। অবশ্য অন্য হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা মাত্র ১২৫-এর মত। যদিও অপেশাদারী হোমিও ডাক্তার বেশ কিছু আছেন। সম্প্রতি যোগ চিকিৎসার সাথে আমেরিকায় হোমিওপ্যাথিরও পুনরাবির্ভাব হচ্ছে (সূত্র : স্প্যান, মে, ১৯৮১, পৃঃ ৪০)। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য আমেরিকা সহ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তুক্‌তাক, মন্ত্রতন্ত্র, বাবা-বাদের পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এও একধরণের সামাজিক অবক্ষয়ের ইংগিত।

তবু, হোমিওপ্যাথির সব দুর্বলতা সত্ত্বেও বহু সৎ ও বিজ্ঞান জানা মানুষও বলেন : হোমিওপ্যাথির ভিত্তি থাক্ বা না থাক্, ব্যাখ্যা থাক্ বা না থাক্ আমি কাজ দেখেছি, তাই বিশ্বাস করি। বিশ্বাসের যেখানে শুরু, বিজ্ঞানের সেখানে শেষ।

আসলে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও সব রোগ নিরাময় করা যা না, নিরাময়যোগ্য রোগও সব সময় সারে না। কিছু কড়া আধুনিক ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ ভীত। আর বিরক্ত প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের অনেকেরই দরদের অভাব, দায়িত্বহীনতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার পরিচয়ে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসকদের সীমাবদ্ধতার ফলেই মানুষের হোমিও-প্রীতি ঘুচছে না। আর আছে ফল পাওয়ার প্রশ্ন। অনেক অসুখই, এমন কি মারাত্মক হলেও প্রকৃতির নিয়মে আপনিই সেরে যায়, বা কমে আসে। পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চললে, ঝড়ে বক মরার নিয়মে হোমিওপ্যাথের পশার বাড়ে। আবার কখনো কখনো রোগ সারার মূলে থাকে রোগীর মনের বিশ্বাস।

> "কোনো কোনো ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ফল ঘটতে পারে অভিভাব-স্বাভিভাবের (suggestion and-auto suggestion) জন্য। হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও ওষুধকে চিকিৎসা-কেন্দ্রে যাচাই করার বহু প্রচেষ্টা থেকে কোনো ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়নি।"
>
> —বৃহৎ সোভিয়েট এন্‌সাইক্লোপিডিয়া

ভারতবর্ষে একদিকে বাড়ছে দারিদ্র্য, অপুষ্টি আর অনাহার। অপর দিকে আধুনিক চিকিৎসকদের মানসিকতা সেবার নয়, না হলে সুশিক্ষিত চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা হাজারে হাজারে ধনবান ইংলণ্ড আমেরিকাবাসীর চিকিৎসা করতে সাগর পার হতেন না। দুঃস্থ, রুগ্ন মানুষ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসতেই পারে না বা খরচে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ভারতে তাই হোমিওপ্যাথের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

ভারতবাসীকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা যোগানোর দায় থেকে ভারতের শাসকেরাও যেন কিছুটা হালকা হতে চাচ্ছেন। তাই কি ১৯৭৩ সালে পাশ হয়েছে হোমিওপ্যাথিক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল আইন আর ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ? ভারতে যার বয়স একশ বছর সেই হোমিওপ্যাথিকে কি তাই দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির মর্যাদা দেওয়া হ'ল ? বলা বাহুল্য, হোমিও ওষুধের বিশুদ্ধতা বা গুণমান পরীক্ষার কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই।

ভারতবর্ষ মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবচ, জ্যোতিষ, হাত দেখার দেশ। মানুষের শরীর ও জীবন নিয়ে ছেলেখেলা এখানে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আই. এম. এ.'র মতো সংস্থাগুলি জনচিকিৎসার ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার বিরুদ্ধে সরব হলেও চলতি ভুয়া চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির ব্যাপারে নীরব কেন ?

সূত্র :

১। বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড : শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯৬২।

২। Medical Encycopaedia : Collins, 1978.

৩। German News : Vol XIX, No. 19, Oct. 15, 1977.

৪। German News ; Vol XIX, No 20, Nov 1, 1977.

৫। ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭৬।

৬। Encyclopaedia Britannica, 15th Ed., 1975 2nd Ed. 1957.

৭। Fads & Fallacies in the Name of Science. Martin Gardner. (Dover Publications Inc New York.)

৮। Great Soviet Encyclopaedia : 3rd Edition, 1970 এর ইংরাজী অনুবাদ।

৯। Healing Power of the Magic Little Pills : A Statesman Survey. Oct 30, 1976.

১০। India : A Reference Annual, 1980, G. O. I.

১১। ভেলকি থেকে ভেষজ : আনন্দকিশোর মুন্সী, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৮।

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার
দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়.(১৮৬১-১৯৪৪)

[Acharya Prafulla Chandra Roy's socio-economic thoughts are briefly analysed. His economic thoughts and social outlooks are equated with those of liberal elements in the National Congress. His personality is viewed from the perspetives of social movement.]

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ শাসন পাকাপোক্ত হয়েছে, গ্রামীণ সমাজের ভিতে যথেষ্ট ফাটল ধরেছে, গ্রামের তাঁতী-কুমোর-কামার-জোলা কৃষক কোম্পানীর অবাধ শোষণে যখন নিঃশেষিত ও মৃতপ্রায়, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন রামমোহন, বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট প্রভাব, এই রকম এক সময়ে সংস্কৃতি-সম্পন্ন উচ্চবিত্ত এক পরিবারে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম। ভারতবর্ষের হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বাজার কেড়ে নিয়েছে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কারখানা, নুনের ওপর একগাদা করের বোঝা চাপান হ'য়েছে, ভারতবর্ষের কারিগরদের তৈরি জিনিসের সাথে সাথে তাদেরও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে বৃটিশ রাজ। গ্রামকে-গ্রাম কারিগর জমিতে খাটতে শুরু করেছে, আর কল-কারখানার জন্য বৃটিশেরা পেয়েছে অসংখ্য সস্তা শ্রমিক। ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির জায়গা দখল করেছে শিল্প বিপ্লবোত্তর উন্নত বৃটেন। ভারতবর্ষের মানচিত্রে ক্ষুধা, আনাহার, দারিদ্র্য, মহামারী, মৃত্যু স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। দারিদ্র্য আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাথে সাথে জাতীয় চেতনারও এই সময় উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীজ ধীরে ধীরে জনমানসে প্রোথিত হয়, এই আন্দোলনের ঢেউ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে যেখানে ছিল সে সেখানে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানচর্চায় এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা দেয়। সংস্কৃতির সব ক'টি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। দেশে শিল্পী, সাহিত্যিক বিজ্ঞানীরা যাঁর যাঁর নিজের একান্ত জগত থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক আন্দোলনের সাথে একাত্মবোধ করেন। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল ; তাঁর কর্মবহুল জীবনে সেই সাক্ষ্য সর্বত্র।

১৮৮২ সালে এডিনবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের অধীনে গবেষণার শুরু। ১৮৮৭ সালে কপার ম্যাগনেসিয়াম যুগ্ম যৌগের সমাকৃতি গঠনের ওপর গবেষণা করে ডি. এসসি ডিগ্রী লাভ করেন। যদিও এর আগেই তরুণ প্রফুল্লচন্দ্র "সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে ভারতবর্ষ" শীর্ষক নিবন্ধ রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে "ভারতবর্ষ" শীর্ষক রচনাবলীতে তাঁর স্বদেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও এই রচনায় একদিকে ভারতবাসীর প্রগতির ক্ষেত্রে বৃটিশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তেমনি অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার আশা-আকাংখাকে অস্বীকার করার জন্য তীব্র নিন্দাও করেছেন। তখন সবেমাত্র জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি অংশের সংগঠিত আন্দোলন রূপ নিচ্ছে। একটি শিল্পোন্নত দেশ থেকে ফিরেই যে-ভাবনাটি সব থেকে বেশী প্রফুল্লচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল তা হ'ল দেশের শিল্পের উন্নতি। স্বদেশী শিল্প বিকাশের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিরলস পরিশ্রম করে চললেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তারই স্বার্থে ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট, কল-কারখানা স্থাপন করল। বৃটিশ কয়েকটি বড় শিল্পের গোড়াপত্তন করলেও মূলতঃ ছিল ছোটখাট সংস্থা যার মধ্যে বাণিজ্যিক ও কারবারী সংগঠনও ছিল। ১৯৮০ সাল নাগাদ ৫৮টি কটন টেক্সটাইল মিল (যার মোট পুঁজির পরিমাণ ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার পাউণ্ড), ২২টি জুট মিল (যার মোট পুঁজির পরিমাণ ২২ লক্ষ ৪৬ হাজার পাউণ্ড), আর বেসরকারী শিল্প সংস্থার সঙ্গে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সংস্থাও ছিল (বিনিয়োগের পরিমাণ মোট ৯ কোটি পাউণ্ড)। এমন কি, ১৯ ৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ছোট সংস্থার সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে। ছোট ছোট শিল্প সংস্থাগুলোয় সুবিধে ছিল যে বড় শিল্প সংস্থার তুলনায় মোট পুঁজি বিনিয়োগ কম করতে হত আর উৎপন্ন জিনিসও সস্তা দরে বিক্রি করা যেত। জুট, টেক্সটাইল, কয়লা, ধাতুশিল্প, চা, উল প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পে বৃটিশ পুঁজির বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করল। দেশের সম্পদ ও শিল্পের যথাযথ ব্যবহার না হলে যে দেশের উন্নতি হবে না এ বিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কোন সংশয় ছিল না। দেশী পুঁজির অবস্থান নিতান্তই দুর্বল ছিল, সেই কারণে জাতীয় আশা-আকাংখা পূরণেও তা সমর্থ হয় নি। নরমপন্থী কংগ্রেস আন্দোলন বৃটিশ পুঁজির সাথে সংঘর্ষের পরিবর্তে সহাবস্থানের

নীতিই গ্রহণ করল। যদিও ১৯০৫ সালের বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং ১৯২২ সালের লবন আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের শিল্প বিকাশে বৃটিশ অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশী শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে বাণিজ্যিক ও কারবারী সংগঠনের সম্প্রসারণও চাইলেন। একই সাথে বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকালস ও অন্যদিকে মার্কেনটাইল মেরিন সংস্থা ও ইনসিওরেন্স সংস্থার সম্প্রসারণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিল্প বিকাশ চিন্তার সীমাবদ্ধতাকেই চিহ্নিত করে। বহু পরিশ্রম ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকালস প্রতিষ্ঠা করেন। কাজের লোকের অভাব, টাকার অভাব, দেশী জিনিস কেনার লোকের অভাব—এই সমস্ত বাধা পেরিয়ে স্বদেশী শিল্পের একটি নমুনা তুলে ধরলেন। কাছাকাছি সময়ে আর একটি শিল্প গড়ে ওঠে যার নাম বেঙ্গল ইমিউনিটি। গোড়া থেকেই এই দুই শিল্পে আধুনিক কারিগরির জ্ঞান সমন্বিত করার চেষ্টা হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় আরও কয়েকটি দেশী শিল্প গড়ে ওঠে যার মধ্যে ক্যালকাটা পটারী ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, ভারতী স্কেল এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বদেশী শিল্পের প্রসারে নরমপন্থী কংগ্রেসের যে অংশটি সহযোগিতার ভিত্তিতে শিল্প প্রসারের কথা বলতেন তাঁদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদিও তিনি কখনই কংগ্রেস রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না।

স্বদেশী শিল্পের প্রসার, সমাজসেবামূলক কাজকর্ম বজায় রেখেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। ধাতব মার্কারীর ওপর লঘু নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়ায় মারকিউরাস নাইট্রাইটের হলুদ কেলাস আবিষ্কার করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেদিন নাইট্রাইট রসায়নের একটি দিগন্ত খুলে দিলেন। এর পরও অজৈব রসায়নে বহু মৌলিক গবেষণা করেন। এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বার্থেলোর অনুপ্রেরণায় ন' বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে দু' খণ্ডে 'হিসট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' শেষ করেন। অতীত ভারতীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানের চর্চা থেকে সংগ্রহ করে তিনি যে প্রামাণ্য দলিল পেশ করলেন তা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন। অতীতকে জেনেই বর্তমানকে বোঝা ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা সম্ভব। অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্যপ্রমাণ সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। হিন্দু সভ্যতার একটু আগে থেকে শুরু করে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু রসায়নের ইতিহাস তিনি এই বইটিতে তুলে ধরেছেন। গোঁড়া হিন্দুদের আচার-বিচার, রক্ষণশীল, পিছিয়ে থাকা মনোভাবের প্রতি বিরূপ থাকলেও হিন্দুদের অতীত ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন সমান শ্রদ্ধাশীল। হিন্দুদের সহনশীলতা ও পাণ্ডিত্যের প্রতিও ছিলেন আস্থাশীল। সাম্প্রদায়ি-

এক বাঙালী রসায়নবিদের আত্মচরিত থেকে

রোজনামচার কয়েকটি পাতা ঃ

জুন ৪, ১৯২২

বহুমুখীতাই আমার দুর্বলতার উৎস। ভোরে কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালের এপ্রিল সংখ্যার পুরোটায় চোখ বোলালাম। তারপর হাতে নিলাম মডার্ন রিভিউ, লাহিড়ীর কর সংক্রান্ত নীতির ওপর লেখাটা পড়লাম আর মলিয়েরের 'টারসেন্টিনারী' (কালিদাস নাগের লেখা)। পরেরটা আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল।

আগষ্ট ৩১, ১৯২২

কি জীবন! ভোরের সময়টুকুও রেহাই নেই। হাজার কাজে সাক্ষাৎপ্রার্থী ও গবেষকদের যেন ঢল নেমেছে। অবশ্য অভিযোগ করব না—খদ্দর প্রচারের ব্যাপারটা বাড়তি বোঝা হল। তারপর পটারী কারখানার ব্যাপারটা, অতঃপর লক্ষ্মী মিলের মিটিং।

অক্টোবর ৬, ১৯২২

অভাগা বাঙ্গলা পুনর্বার এক দুর্যোগে পড়ল এবং একাজে যত অনপুযুক্তই হই না কেন পুনরায় ত্রাণকার্য পরিচালনায় আমার ডাক পড়ল। বিস্ময়ের কথা হলেও, গবেষণার কাজ ভালই চলছে—বলতে কি এত ভাল ফল পাওয়া আমার ভাগ্যে আগে কখনও ঘটেনি।

বড়দিন, ১৯২২

প্ল্যাটিনামের যোজ্যতার প্রমাণ পেলাম। ল্যাবরেটরীর কাজ চলছে জোর কদম। দুটো গবেষণা পত্র প্রায় শেষ হবার পথে। আর দু'টোর মশলা জড়ো হচ্ছে। বন্যাত্রাণের কাজ কিছুটা হাল্কা হয়েছে, তাই ল্যাবরেটরীর কাজ হচ্ছে দ্রুতলয়ে—উৎসাহে ভরপুর, উদ্যমে কমতি নেই।

বিজ্ঞান থেকে রাজনীতি ঃ

অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন আমি ঘোষণা করি—বিজ্ঞানের কাজ কিছুদিন অপেক্ষা করলেও করতে পারে কিন্তু স্বরাজ নয়। মহান স্টানিসলাও ক্যানিজারো যখন একজন রসায়নবিদ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করতে যাবেন এবং তারজন্য তিনি যখন পুরোমাত্রায় উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন তখনই ঘটল ১৮৪৮ সালের ঘটনা ও স্থির করে দিল তাঁর ভবিষ্যৎ। তিনি তাঁর ল্যাবরেটরীর দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলেন বন্দুক।

* * * *

যদিও আমি আগে বলেছি যে আমি প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই নি, তবু একে পুরোপুরি এড়িয়েও থাকতে পারি নি। ঐ সময় (১৯২১-২৫) প্রায়ই আমাকে রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়াতে হয়েছে।

সূত্র ঃ অটোবায়োগ্রাফি অফ এ বেঙ্গলী কেমিষ্ট—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ওরিয়েণ্ট বুক কোং, কলিকাতা, ১৯৫৮)

কতার বিরুদ্ধে বরাবর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করেছেন। জাতপাতের বিচার সম্পর্কেও তিনি ছিলেন একই রকম বিরূপ। ১৯২১ সালে খুলনার দুর্ভিক্ষে, ১৯২২ ও ১৯৩১ সালের উত্তরবঙ্গের বন্যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ত্রাণ কমিটি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময় আচার্যের পাশে ছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সেদিনের ত্রাণ কমিটির কার্যালয় ছিল বিজ্ঞান কলেজ—আজ যে কথা শুনলে তাঁরই অনেক ভক্তরা আঁৎকে উঠবেন।

এই সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও অজৈব রসায়নে নানা গবেষণার কাজে লিপ্ত থেকে তাঁর ছাত্র ও কলকাতার কয়েকজন কৃতী রসায়নবিদকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে ডঃ প্রিয়দা রায়, জ্ঞান ঘোষ, ডঃ জ্ঞান মুখার্জী ও ডঃ পি. বি. সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য তখন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল ছাড়া আর কোন জার্ণাল ছিল না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৯২১ সালে ইণ্ডিয়ান কেমিকাল সোসাইটি গঠন করেন। এই সোসাইটির জার্ণালেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবে এই ছিল উদ্দেশ্য। আজকের নামী দামী রসায়নবিদ্, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরাগী ভক্ত জনেরাও তাঁদের গবেষণাপত্র এই জার্ণালে প্রকাশ করেন না, যে সমস্ত ঝড়তি পড়তি গবেষণাপত্র বিদেশের জার্ণালে বাতিল হতে পারে সেই সমস্ত গবেষণাপত্রই এখানে প্রকাশের জন্য পাঠান হয়। ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্সের রসায়ন বিভাগের রূপকার, ভারতবর্ষে রসায়ন শাস্ত্রের পথিকৃৎ তাঁর সার্থক উত্তরসূরী রেখে যেতে পারলেন না।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে অংশ বৃটিশ শাসনের অবসান চেয়েছিলেন, যাঁরা স্বদেশী শিল্পের বিকাশে বৃটিশ পুঁজির সাথে সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে দেশীয় শিল্পের স্বনির্ভর বিকাশের প্রয়াসী ছিলেন, যাঁরা অতীত ঐতিহ্যের মহিমামণ্ডিত অধ্যায়ের পুনরুত্থানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী, দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী বলে পরিচিত হয়ে থাকবেন।

যে সমস্ত বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. Acharya Prafulla Chandra Roy : Birth Centenary Vol., (Cal. Univ. 1962)
2. Life and Experiences of a Bengali Chemist : —Prafulla Chandra Roy (Kegan Paul, Trench, Trabner & Co. Ltd. 1932.)
3. Do P. C. Roy. (Kegan Paul, Trench, Trabner & Co. Ltd. 1935.)
4. History of Chemistry in Ancient and Medieval India Edited by P. Roy. (Indian Chemical Society : Calcutta 1956.)
5. India in Tranisition—M. N. Roy : (Nahiketa Publication Ltd. 1971.)
6. Historic Premises for India's Transition to Capitalism ('Nauka' Publishing House ; Moscow, 1979).
7. Industrialisation of India ; G. K. Shirokov (Peoples' Publishing House, 1980.)

পার্থ সেন,
নরসিংহ দত্ত কলেজ

ক্যানসারের কারণ কী ? একটি বিতর্ক

ক্যানসার বা কর্কট রোগ নিয়ে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ভাবিত। ক্যানসারের প্রকোপ ক্রমশ বেড়ে চলছে কেন ও এ ব্যাপারে পরিবেশ দূষণের ভূমিকা কতটা তা নিয়ে সম্প্রতি বিতর্কের হাওয়া উঠেছে ('নেচার' ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১)। 'দ্য পলিটিক্স অফ ক্যানসার' বইয়ে এপস্টাইন নামে এক বিজ্ঞানী বহু তথ্য সহকারে বক্তব্য হাজির করেছেন যে পরিবেশে তেজস্ক্রিয় বিকীরণ ও বহু ক্ষতিকর রাসায়নিক 'কার্সিনোজেন' [যা ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে] এর প্রাদুর্ভাবের ফলে ক্যানসার বাড়ছে। 'নেচার' পত্রিকায় এক নিবন্ধেও এই বক্তব্য রেখেছেন এপস্টাইন ও সোয়ার্তজ। কিন্তু 'নেচার'-এই অন্য কিছু বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন এই সিদ্ধান্তের ভিৎ কতটা পাকা তা নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য বড়জোর দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া ক্যানসার সৃষ্টিতে তথাকথিত কার্সিনোজেনগুলির ভূমিকা যথেষ্ট ভালভাবে প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তেজস্ক্রিয় বিকীরণ বা রাসায়নিক কার্সিনোজেন দেহজ কোষের ভিতরকার ডি-এন-এ অণুর কোন এক জায়গায় পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্যানসার সৃষ্টি করে, এই অনুমানের উপর যথেষ্ট সন্দেহের ছায়াপাত ঘটিয়েছেন কেয়ার্ন্স তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে ('নেচার' খণ্ড ১৮৯, পৃঃ ৩৫৩-৫৫, ১৯৮১)। 'নেচার'-এর সম্পাদকীয় মতে "মানুষের ক্যানসার জীবনবিজ্ঞানের এমন একটি বিষয় যা এখনো

বোঝা যায় নি"। এই অবস্থায় ক্যানসারের প্রকোপ বাড়ার কারণ হিসেবে তথাকথিত কার্সিনোজেনগুলিকে দায়ী করলে তা ঠিক বিজ্ঞান-সম্মত হবে না, এই হল এপস্টাইনের বিরুদ্ধ মত।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বিতর্কটির যে তাৎপর্যই থাক, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে রাসায়নিক শিল্পের স্বার্থ। পাশ্চাত্যে রাসায়নিক শিল্পগুলি দানবীয় আকারের, তাদের ক্ষমতাও প্রচুর। পরিবেশ দূষণে এদের ভূমিকা নিয়ে পাশ্চাত্যে প্রচুর হৈচৈ হচ্ছে। এর সঙ্গে যদি আবার ক্যানসারের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তবে বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী-গুলোকে যথেষ্ট ক্ষতি সইতে হতে পারে। ক্যানসারের সঙ্গে কার্সি-নোজেনগুলির সরাসরি কোন সম্পর্ক প্রমাণিত হয় নি, এ বক্তব্য যদি সঠিকও হয়, তবু মনে সন্দেহ জাগে আজকের এই বিতর্কের পিছনে রাসায়নিক শিল্পের মালিক গোষ্ঠীগুলির হাত নেই ত?

আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্প অনেক ছোট মাপের। তবু আমাদের পরিবেশে ক্ষতিকর রাসায়নিকগুলির মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। এগুলির ফলে ক্যানসার হতে পারে কিনা তা তর্কসাপেক্ষ হলেও পরিপাকতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদির রোগ, ভ্রূণনাশ ইত্যাদি যে বাড়ছে তাও কি তর্কের বিষয়? অথচ এ নিয়ে কোন আন্দোলন নেই। ভয় হয় আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেই আবার অনেক 'বিজ্ঞানী' ভালমত কিছু না বুঝেই পাশ্চাত্যের পোঁ ধরে না আগ বাড়িয়ে বলে বসেন যে পরিবেশে জমতে থাকা রাসায়নিকগুলির কোন ক্ষতিকর প্রভাব 'প্রমাণ' হয় নি।

মুনাফার স্বার্থে কার্সিনোজেন পাচার:

বাচ্চাদের রাতের পোশাকে যাতে চট করে আগুন না লাগে তার জন্য কাপড়ে 'ট্রিস' (TRIS) নামে একটি রাসায়নিক লাগানো হয়। এটি কার্সিনোজেন অর্থাৎ ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক হিসাবে চিহ্নিত। ফলে আমেরিকায় ঐ পোশাক বিক্রী নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তৈরী পোশাক ত' আর ফেলে দেওয়া যায় না। তাতে যে মুনাফা কমে যাবে। তাই পোশাক প্রস্তুতকারকরা ঐ ধরনের ২৪ লক্ষ পোশাক আমেরিকার বাইরে বিক্রির জন্য পাঠিয়েছিল।

সায়েন্স টু-ডে (জুন, ১৯৮১)

নিজস্ব প্রতিবেদক

জানবার কথা। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ কঠিন কেন?

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা 'ফ্লু' অত্যন্ত পরিচিত অসুখ। কিন্তু এর চিকিৎসা নেই, প্রতিষেধক টিকেও খুব কার্যকর নয়। প্রায়ই অসুক বিপজ্জনক হয় না, তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার মারাত্মক মহামারীর আকারে দেখা দেয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। এইরকমই একটি মহামারী ১৯৫৮ সালে সম্ভবত চীন থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে; এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'এশিয়ান ফ্লু'। মহামারী ছাড়াও, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের রোগীদের পক্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জা খুবই মারাত্মক। কিন্তু তবু এর কার্যকর প্রতিরোধ এখনো সম্ভব হয় নি। 'ফ্লু' ভাইরাস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এর আণুবীক্ষণিক গঠন খুব ভালভাবেই জানা আছে। কিন্তু ভাইরাসটির বিশেষত্ব হল এর আবরণীর উপরে যে অ্যান্টিজেনগুলি থাকে সেগুলির গঠন ও বিন্যাস দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এই অ্যান্টিজেন অনুসারে মানুষের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরী হয়ে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে উঠতে না উঠতেই নতুন ধরনের অ্যান্টিজেনের আবির্ভাব হয়ে ভাইরাসটিকে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। কিছু কিছু পরিবর্তন মামুলি ধরনের ও এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধও বেশ কিছুটা তৈরী হওয়া সম্ভব। কিন্তু আর কিছু পরিবর্তন বড় ধরনের। ১৯৫৮-র মহামারী এই ধরনের একটি পরিবর্তনের ফলেই ছড়িয়েছিল। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য অসুবিধার দরুন এর জোরালো প্রতিষেধক টিকে তৈরী করা যায় নি। যে টিকে তৈরী হয়েছে তার ব্যবহারে আদৌ কোন লাভ আছে কিনা এ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। রাশিয়ায় সক্রিয় ভাইরাসের সাহায্যে যে টিকে তৈরী হয় অনেকে বলেন তা ক্ষতিকরও হতে পারে। আবার অনেকে বলেন, যদি সামান্য কিছু ফলও পাওয়া যায় তবে তাতে আপত্তি কি? বিশেষত, নিষ্ক্রিয় ভাইরাসের সাহায্যে তৈরী টিকের ক্ষেত্রে? তবে এই টিকে অ্যান্টিজেনের বড় ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট মহামারীর ক্ষেত্রে কাজের হবে না। সক্রিয় ভাইরাস নিয়ে তৈরী টিকে সেখানে কাজ দিতে পারে।

[**সূত্র**: আমেরিকান সায়েন্টিস্ট, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮১, পৃঃ ১৬৬-১৭২]

PRL—গবেষণাগার না কি পুলিশ ব্যারাক ?

আমেদাবাদের ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী (PRL) আমাদের দেশের গুটিকয়েক প্রেস্টিজিয়াস ইনস্টিটিউটের একটি। অনেক বড় বড় লোক কাজ করেন ওখানে। দরাজ হাতে ব্যয় হয় অর্থ। আর সেজন্যই আমরা জানতে চাইতে পারি বৈকি যে কি হয় ওখানে অথবা যা হয় তার সাথে আমার আপনার বা আমাদের জাতীয় স্বার্থের যোগ কতখানি। এসব বিষয়ে একটু আধটু খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম JACARIর ২য় বার্ষিক কনভেনসনে আগত PRLএর প্রতিনিধি ডঃ মুকুল সিন্‌হার কাছে। সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণটি হাজির করছি এখানে।

আমরা : আচ্ছা মুকুলবাবু, PRLয়ের একজন বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে আপনার পরিচয়টি যদি আমাদের জানান।

ডঃ সিন্‌হা : (একটু হেসে চটপট উত্তর দেন) এ ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি আমি কখনও হইনি। যাহোক সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই রকম। ১৯৭৪ সালে পদার্থবিদ্যার একজন গবেষক হিসেবে PRLএ যোগ দিই। ৭৮ সালে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি পাওয়ার পর ৭৯ সালে ওখানে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট পদে নিযুক্ত হই। আমার কাজের বিষয় ছিল Plasma Physics।

আ : শুনেছি PRLয়ে বহু আধুনিক বিষয়ে গবেষণাকর্ম চলছে। মূলতঃ কোন কোন বিষয়ে কাজ হচ্ছে বর্তমানে ?

সি : মোটামুটি কাজের বিষয়গুলি হল—

Geo-cosmo physics, Theoretical physics—nuclear & plasma physics, Experimental plasma physics, Solar and planetary physics, Archaeology & Hydrology.

আ : মোট কত লোক ওখানে কাজ করেন ?

সি : চল্লিশ জনের মত সায়েন্টিস্ট এবং প্রায় শ' ছয়েক সহায়ক কর্মী আছেন ওখানে।

আ : দেখুন মুকুলবাবু, PRL সম্পর্কে বাইরে তো খুব হাঁকডাক। আর যেখানে এত সব নামীদামী বিজ্ঞানী ও যন্ত্র-কুশলী লোকজন কাজ করেন, সাধারণ মানুষের ধারণা সেখানকার কাজকর্ম চিন্তা-ভাবনার পরিসর কতই না বিস্তৃত ও উদার, পরিবেশ কতই না খোলা-মেলা ও যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু আমরা জানি বাস্তব পরিস্থিতি মোটেই তা নয়। কারণ ওখানকার পরিচালন কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর কিছু কিছু খবর আমরা জানি। আর এও জানি যে আপনিও তাদের একজন যারা সেই স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর শিকার। সেজন্যই আপনার কাছে এসেছি সেখানকার ব্যাপার-স্যাপার কিছু জানতে। তা এ ব্যাপারে আলোচনায় আপনার আপত্তি নেই তো কিছু ?

• •

সি : আপত্তি কেন থাকবে ? আমরা তো চাই দেশের মানুষ জানুক প্রকৃত ঘটনা। জানুক কাদের হাতে ন্যস্ত ভারতীয় বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ। সরকারী প্রশ্রয় ও প্রচারপুষ্ট মুষ্টিমেয় কিছু পায়াভারী বিজ্ঞানীর খামখেয়ালী আচরণের জোয়াল থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানের ভবিষ্যতকে রক্ষা করতেই তো আমাদের এই সংগ্রাম।

আ : ধন্যবাদ ডঃ সিন্‌হা। তা হলে বলুন কর্তৃপক্ষের সাথে আপনাদের বিরোধের মূল কারণটি কি ?

সি : মূল কারণ তো একটিই—উপরতলার লোকজনের খাম' খেয়ালী আচরণ। আমাদের সংস্থার ডিরেক্টর প্রফেসর দেবেন্দ্র লাল—সংক্ষেপে ডি লাল, তাঁর জমিদারী মেজাজ এবং আমলাতান্ত্রিক পরিচালন কায়দা—সবকিছুর মূলে।

আ : ঠিক কি কারণে বিরোধগুলো দেখা দিয়েছে যদি একটু খুলে বলেন।

সি : দেখুন ব্যাপারগুলো তো সব একত্রিত ঘটেনি। তাই এর পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে সময়ের পথ ধরে বেশ খানিকটা পেছনে যেতে হবে আমাদের।

আ : ঠিক আছে বলুন সংক্ষেপে সেই ঘটনা।

সি : দেখুন আমাদের ওখানে অনেকদিন আগে থেকেই ডঃ বিক্রম সরাভাই ডিরেক্টর থাকাকালীন সময় থেকে Staff Welfare Association (SWA) নামে একটি সংগঠন ছিল। ডঃ সরাভাইর মৃত্যুর পর ১৯৭২ সালে ডঃ লাল এখানে এসে থেকেই এই সংগঠনটিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নেন। কারণ একা একা না থেকে মানুষ সংগঠনবদ্ধ হলেই তাঁর আপত্তি। বিশেষ করে তিনি চটে গেলেন যখন SWA তাঁর কিছু আচরণে প্রকাশ্যে আপত্তি জানালো। যেমন PRLয়ে জয়েন করার সময় তিনি এখানে তাঁর ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে যোগদানের শর্ত হিসাবে তাঁর পূর্বতন কর্মস্থল Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) থেকে একদল গবেষক, কর্মী ইত্যাদিকে নিয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন। কোনোরকম নিয়ম কানুন প্রথার তোয়াক্কা না করে তিনি এদের সকলকে প্রমোশন ও

আর্থিক সুবিধাদি দিতে থাকেন। এজন্য SWA প্রতিবাদ জানায়। পরিণামে ওই সংগঠনের ওপর ডিরেক্টরের খড়্গহস্ত নেমে আসে—সংগঠন বাতিল হয় এবং তার যুগ্ম সম্পাদক মিঃ ওয়াই এল আগরওয়ালের চাকুরী যায়। সেটা ছিল ১৯৭৪ সাল। সেদিন এর প্রতিবাদে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে সামিল হন। কিন্তু সাংগঠনিক ভিত্তি না থাকায় একে ফলপ্রসু করে তোলা যায়নি।

আঃ এরপর আবার কবে আপনারা কর্তৃপক্ষের মুখোমুখী হন?

সিঃ বড় অদ্ভুতভাবে ঘটে গেল একটি ঘটনা। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে PRLয়ের সিকিউরিটি স্টাফেরা একটি দাবী সনদ পেশ করেন ডিরেক্টরের কাছে। স্বভাবসিদ্ধ ভংগিতে ডিরেক্টর উপেক্ষা করেন সেই দাবী সকল। এর পর ১৬ই জুন তারিখে কালো ব্যাজ ধারণ করে ওই সিকিউরিটি গার্ডরা জানায় এর বিরুদ্ধে নিঃশব্দ প্রতিবাদ। ব্যস, লালবাবু ক্ষেপে আরও লাল। বেপরোয়া তিনি PRL চত্বরে ঢুকিয়ে দিলেন বিরাট এক বাহিনী Central Industrial Security Force (CISF)। বুঝুন, এক চিলতে কালো ব্যাজেই এই প্রতিক্রিয়া। এটা অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। কারণ আপনারা জানেন CISF কোন সরকারী সংস্থা ব্যতিরেকে আর কোথাও নিযুক্ত হতে পারে না। আর একান্ত প্রয়োজন হলেও রাজ্য সরকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া তা কখনই সম্ভব নয়। অথচ এক্ষেত্রে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে তাঁর অজ্ঞাতে, অতএব তা বে-আইনী।

আঃ আপনাদের মনোভাব এরপর জানালেন কি ভাবে? আপনাদের তো কোন স্বীকৃত সংগঠন ছিল না।

সিঃ ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, ইতিমধ্যে ২৯শে মে ১৯৭৯ তারিখে আমাদের "PRL Employees' Union" নামক সংগঠনটি সরকারী রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যায় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় সকলেই এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। আমাদের চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ ওই সিকিউরিটি স্টাফদের পরিবর্ত কাজে বহাল করতে বাধ্য হন। CISF ল্যাবরেটরির পাহারায় নিযুক্ত হল আর পুরানো সিকিউরিটির লোকেরা বহাল হল কর্মীদের আবাসিক এলাকার পাহারায়। আগে যেখানে নজরদারীতে খরচ ছিল বার্ষিক আশি হাজার টাকা বর্তমান ব্যবস্থায় তা বাড়ল আরও চার লক্ষ টাকা। ভাবুন অবস্থাখানা!!

আঃ বুঝলাম। অথচ ওই বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন একটি বিজ্ঞান বিভাগে পাঁচ লক্ষ টাকাও বরাদ্দ ছিল কিনা সন্দেহ। যাহোক বলুন এর পরের ঘটনা।

সিঃ একদিকে আমাদের সিকিউরিটি স্টাফরা CISF নিয়োগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলেন। অন্যদিকে আমরা দিনে পাঁচজন করে ছুটি নিয়ে রিলে অনশন শুরু করলাম। এর ফলে PRL-এর লোকজন আবার একবার কর্তৃপক্ষের উলঙ্গ চেহারাটা দেখবার সুযোগ পেলেন। ২২শে জুলাই, ১৯৭৯ তারিখে, যা কোনদিন শোনা যায়নি—তেমন একটি ঘটনাই ঘটল। PRLএ লকআউট ঘোষিত হল। তবে আদালতের হুকুমে অচিরেই সমস্ত কর্মীকে নিঃশর্তভাবে ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে দিতে হল।

আঃ প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনাদের এইসব বিক্ষোভ ও আন্দোলনে কি আপনারা সকল শ্রেণীর কর্মীদেরই আপনাদের পাশে পেয়েছিলেন?

সিঃ মোটেই না। শুনলে অবাক হবেন কর্তৃপক্ষের এতো সব অন্যায় আচরণের পরও একজনও ফেকাল্‌টি মেম্বার আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন নি। বরং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে তাদের বেশ কয়েকজন ডিরেক্টরের কর্মচারীবিরোধী কাজকর্মে বেশ সক্রিয়ভাবে মদত দিয়েছেন। সেই তুলনায় আপনাদের এখানকার হালচাল তো সম্পূর্ণ ভিন্নতর। অন্তত JACARIকে দেখে তো আমার তাই মনে হচ্ছে।

আঃ যাহোক পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ল্যাবরেটরীতে তো সবাই প্রবেশাধিকার পেলেন। তারপর তো সব ঠিকঠাক চলতে শুরু করল—নাকি?

সিঃ মোটেই না। এর পরেই শুরু হল লাল বাবুর আসল খেল। ২৫শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে পুরো মিলিটারী শাসন শুরু হল PRL চত্বরে। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন সদস্যকে শাসানো হতে লাগল। পাঁচজনকে সাস্‌পেন্‌সন নোটিশ দেওয়া হল এবং অবশেষে দোসরা নভেম্বর আমার ওপর জারি হল ছাঁটাই নোটিশ। বোধ হয় আমার অপরাধ ইউনিয়নের সম্পাদকগিরি। সাথে সাথে আমাদের রেজিস্টার্ড ইউনিয়নকেও বাতিল করে দিলেন ডিরেক্টর এক ফতোয়া জারী করে। এই দুয়ের বিরুদ্ধেই আমরা গুজরাট হাইকোর্টে আপীল করি এবং কোর্ট থেকে স্টে-অর্ডার পাই।

আঃ এখানে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে আমাদের। যেখানে দেশের সর্বোচ্চ একটি গবেষণা কেন্দ্রের উচ্চশিক্ষিত মানুষগুলি তাদের জেদ এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে একের পর এক কুকীর্তি করে চলেছেন সেখানে পুরানো ঐতিহ্যবাহক আদালত যেন বেশ সুস্থতার প্রমাণ দিয়ে চলেছেন?

সিঃ ঠিকই বলেছেন। আর আদালতের এই আচরণের ফলেই বোধ হয় লাল সাহেব প্রায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে একের পর এক মিথ্য কেস সাজিয়ে কর্মীদের এক এক জনের বিরুদ্ধে নালিশ হাজির করতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মিথ্যা সাক্ষীরা শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে পড়ায় তাঁর সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যেতে লাগল

এবং একের পর এক অপদস্থ হতে লাগলেন।

আঃ বুঝতে পারছি কর্তৃপক্ষের এক একটি কুকর্মকে ঢাকতে আর পাঁচটা কুকর্মে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে এবং এর মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলেছে।

সিঃ ঠিক তাই। আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলা সাজিয়ে হেনস্তা করার অভিযোগে ভারতবর্ষের এক মহান বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের তথাকথিত একজন FRS বিজ্ঞানীকেও শমন পেতে হল Criminal Court এর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার।

আঃ আপনাদের এই আন্দোলনে সেখানকার সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহায়তা কেমন পেয়েছেন?

সিঃ দেখুন স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের এই সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করে তথাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। জানেন নিশ্চই গুজরাটে বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব নেই বল্লেই চলে। অতএব সমর্থনের ব্যাপারটা প্রায় আসেই না। সে জন্যই একটা নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি পেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, যেতে হয় আদালতের দরজায়। অনুমতি পেলেও সেটা অনুষ্ঠিত হয় বহু পুলিশ সি. আর. পি'র প্রহরায়। আর 'মে'দিবস পালন করতে হয় তো রীতিমত রাইফেল উচানো কয়েকটি ট্রাক এস. আর পি'র বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে। অবশ্য আমরা মনে করি এটা আমাদের প্রতি গার্ড অব অনার বলে। তবে এখানে উল্লেখ্য, পত্র পত্রিকার মধ্যে Times of India বেশ কয়েকবার খবর ছেপে আমাদের সংবাদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে সাহায্য করেছেন।

আঃ আচ্ছা মুকুলবাবু আমাদের আলোচনা যে পর্যায়ে এসে পৌছেছে সেখানে দাঁড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে এমন একটি প্রশ্ন করছি। আচ্ছা, আপনাদের PRLয়ের বাৎসরিক ব্যয় আন্দাজ কত হবে?

সিঃ অপ্রাসঙ্গিক কেন হবে? অবশ্যই এ প্রশ্ন বিবেচনার যোগ্য। আমরা মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিজ্ঞানের নামে এক ধরণের উচ্চমার্গীয় বিলাসিতা চালাব আর তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না? তা কি করে হয়? আমাদের সংস্থার বাৎসরিক ব্যয় দু' কোটি টাকার মত।

আঃ একটু অবাক না হয়ে পারলাম না ডঃ সিন্‌হা। একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সায়েন্টিস্টের সংখ্যা সাকুল্যে চল্লিশ তার ব্যয় দুকোটি টাকা! অথচ কিছু মনে করবেন না গত বছরের Science Todayর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি পর্যালোচনায় দেখেছিলাম ওখানে যাঁরা গবেষণার কাজে নিযুক্ত তাদের বেশীর ভাগেরই দেশের চেয়ে বিদেশের প্রতি যেন দায়বদ্ধতা বেশী বলে মনে হয় এবং যে ধরণের কাজ সেখানে হয় তা যেন "more akin to the interests of foreign scientists, especially those in the US and are in a way alien to the need of India"। তা এ ব্যাপারে আপনার মত?

সিঃ দেখুন সত্য যা তা স্বীকার না করে উপায় কি?

ডঃ মুকুল সিন্‌হার কাছ থেকে আমাদের দেশের অপর প্রান্তে অবস্থিত একটি রাজ্যের সক্রিয় বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলনের বিবরণ শুনতে ভালই লাগছিল এবং আমাদের সামনে সচল টেপ রেকর্ডারটির বুকে আরও বেশ কয়েক গজ ফিতে ভরাট হতে বাকী তখনও। কিন্তু বাদ সাধলেন JACARIর কর্ম সমিতির সেই সদস্যরা—যাঁরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলেন মুকুল বাবুর সাথে বৈঠকের জন্য। তাই পরস্পর ধন্যবাদ বিনিময় করে আমাদের সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ করতে হল।

(ইংরেজীতে) সাক্ষাৎকার নিয়েছেন—

পার্থ সেন

অংশুতোষ খান

এবং **রবীন চক্রবর্তী**

ক'লকা ।র প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী প্রয়াত সুভাষ মুখার্জীর আত্মহত্যাজনিত আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে আমরা আমরা' গভ. । বিচলিত ও মর্মাহত। হতাশা ও নৈরাশ্যজনিত কারণে বিজ্ঞানীদের আত্মহননের ঘটনা এদেশে আজ আর মোটেই বিরল নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল প্রায় প্রত্যেকটি এ ধরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য, অবহেলা ও দুর্ব্যবহারের সরব অভিযোগ ওঠে—সে কর্তৃপক্ষ সরাসরি কোন সরকারই হোন বা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকগোষ্ঠীই হোন! কিছুদিন যেতে-না যেতেই সব কোলাহল থেমে যায়—অথচ বহাল তবিয়তে বজায় থাকে সেই ঘাতক ব্যবস্থাটি; যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেই চলে। একটি সুষ্ঠু পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মাধ্যমে বর্তমান ঘটনার প্রকৃত উৎস সন্ধান, ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি এবং সম্ভব হ'লে খুনে ব্যবস্থাটির সমূলে উচ্ছেদই আজ আমাদের কাম্য।

—সঃ মঃ বি-ও-বি

পরিচ্ছন্ন মারণবোমা

১৯৩০ সালে জার্মানী যে রকেট তৈরী করতে পেরেছিল, তার একটা কারণ, ভার্সাই চুক্তিতে এ বিষয়ে কোন নিষেধ ছিল না। এই চুক্তিতে এরোপ্লেন ইত্যাদির উল্লেখ ছিল, কিন্তু রকেটের উল্লেখ ছিল না, কারণ রকেটের ব্যাপারটা তখন ভাবাই হয় নি। যে লোকেরা চুক্তি তৈরী করেছিল তাদের ক্ষমতা ছিল না (এ বিষয়ে) কতটা কি হতে পারে বোঝা। স্পষ্টতই এটা একটা সমস্যা। সব অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির ক্ষেত্রেই এই সমস্যা রয়েছে: চালু কারিগরির কথা মাথায় রেখে যে সব চুক্তি হয় নতুন কারিগরী দেগুলিকে অতিক্রম করে যায়।

হারবার্ট এফ. ইয়র্ক

মিলিমিটার মাপের একটা ছোট্ট দানা। তার ভিতর রয়েছে হাইড্রোজেন-এর আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম (ডি) ও ট্রিটিয়াম (টি)। চারিদিক থেকে তার উপর ফেলা হচ্ছে তীব্র লেসার রশ্মি। খুব বেশী রকম তীব্র রশ্মি (10^{14} ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন) যদি এক সেকেণ্ডের মাত্র এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ সময় ধরে ফেলা যায় ঐ দানার উপর তাহলে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তাপমাত্রা উঠবে দশ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পরমাণুগুলির ইলেকট্রন তাদের কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হবে 'প্লাজমা'। কণিকাগুলি তাদের নিজেদের জাড্যের জন্যই ঐ সামান্য সময়ের মধ্যে ছিটকে যেতে পারবে না বেশী দূর। ফলে দানার ভিতর ঘটবে তাপপারমাণবিক সংযোজন —থার্মনিউক্লিয়ার ফিউসন। তারপর বিস্ফোরণ।

লেসার রশ্মী ব্যবহারের সুবিধা, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে তাপমাত্রা তোলা যায় বলে প্লাজমা তার নিজের জাড্যের দরুনই আবদ্ধ থাকে ('ইনারসিয়াল কনফাইনমেণ্ট'), চৌম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে তাকে আবদ্ধ রাখার (ম্যাগনেটিক কনফাইনমেণ্ট) প্রয়োজন হয় না ও সে সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও ওঠে না।

অতি আধুনিক বিস্ফোরক ও বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে লেসার খুলে দিয়েছে বিপজ্জনক সম্ভাবনার দরজা। লেসারে আলো বিকীরণকারী বস্তুর অণু বা পরমাণুগুলিকে এমনভাবে উত্তেজিত করা হয় যাতে তাদের থেকে বিকীরণ বেরোয় একযোগে। এতে বিকীরণ হয় অত্যন্ত তীব্র। ১৯৬০ সালে লেসার তৈরী হওয়ার পর থেকেই অস্ত্রশস্ত্রের গবেষণায় এর প্রয়োগ শুরু হয়েছিল জোর কদমে। এগুলির অন্যতম ছিল লেসারের সাহায্যে ফিউসন বোমা বা 'হাইড্রোজেন বোমা' ফাটানো। সেই সময় ফিসন বোমার ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় প্রভাব নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে। যুদ্ধবিশারদরা আশ্বাস দিলেন, আর ভয় নেই, এবার তৈরী হতে চলেছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার বোমা। ফিসন বোমার মত অপরিষ্কার তেজস্ক্রিয়তা এ থেকে বেরুবে না। অবশ্য এ কথা বলা হল না যে এই বোমা থেকে যেসব দ্রুতগামী নিউট্রন বেরুবে সেগুলি বিভিন্ন পদার্থে নতুন করে তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করবে। এডওয়ার্ড টেলার ('হাইড্রোজেন বোমার জনক' বলে কথিত এই বিজ্ঞানী কিছুদিন আগে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হাইড্রোজেন বোমার ব্যাপারে তাঁর পিতৃত্ব অস্বীকার করেছেন, যদিও এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি অস্বীকার করতে পারেন নি) ও ই. ও. লরেন্সের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৫৭ সালে আইসেনহাওয়ার সগর্বে বিবৃতি দিয়েছিলেন "এঁরা পরিষ্কার বোমা বানানোর চেষ্টা করছেন।..... এঁরা বলছেন, আমাদের অগ্রগতির প্রতিটা পদক্ষেপ যাচাই করে নেওয়ার জন্য চার-পাচ বছর করে সময় দিলে আমরা সম্পূর্ণ পরিষ্কার একটা বোমা বানিয়ে দেবো।"

এই ধরণের প্রচারের জোরে 'লেসার ফিউসন' গবেষণা এগুতে থাকল দ্রুত গতিতে। ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে বাতাসে তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ হওয়ায় লেসার গবেষণার উপর আরো জোর দেওয়া হল—বাতাসে বিস্ফোরণ ঘটালে তার বিভিন্ন প্রভাব কি হতে পারে লেসার বোমার সাহায্যে তা পরীক্ষা করার আশায়।

লেসার অস্ত্রের পিছনে আমেরিকা এ পর্যন্ত ১২০ কোটি ডলার খরচ করেছে।

আনন্দবাজার, ২৫।৬।৮১

১৯৭০ নাগাদ অবশ্য দেখা গেল যে বড় আকারের হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর ক্ষেত্রে আপাতত লেসার ব্যবহার করে খুব একটা সুবিধা পাওয়া যাবে না। ফলে আবার উল্টো প্রচার হতে থাকল। যুদ্ধ-বিশারদরা বলতে থাকলেন যে না, লেসার ফিউসন তেমন ভীতিপ্রদ কিছু নয়। ১৯৭৫ সালে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার সীমিতকরণ চুক্তির পর্যালোচনায় বলা হল যে লেসার ফিউসন পারমাণবিক-বিধ্বংসী অস্ত্রের আওতায় পড়ে না। ফলে এ সংক্রান্ত গবেষণার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হল না।

বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে লেসার ফিউসনের বিপজ্জনক সম্ভাবনাগুলি কিন্তু যা ছিল তাই আছে। শুধু এই মুহূর্তে হয়তো তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এ সংক্রান্ত গবেষণার উপর কোন বিধিনিষেধ না থাকার ফলে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা বরঞ্চ আরো বেশী। ৩০এর দশকে জার্মানীর রকেট তৈরীর দৃষ্টান্তটি এখানে প্রাসঙ্গিক। "চালু কারিগরির কথা মাথায় রেখে যে সব চুক্তি হয় নতুন কারিগরি তাকে অতিক্রম করে যায়।" ফিশন বোমা তৈরীর উপর বিধিনিষেধ আরোপের কচলাকচলি চলতে চলতে হয়ত হঠাৎ দেখা যাবে যে সম্মুখে হাজির হয়েছে এমন একটি বিধ্বংসী অস্ত্র, চুক্তিতে যার কোন উল্লেখই নেই। আজ যাঁরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্বার্থে লেসার প্লাজমা বা লেসার ফিউসন নিয়ে কাজ করছেন তখন তাঁরা কি করবেন? পাগল হয়ে যাবেন? না কি মানব জাতিকে একটি পরিষ্কার মৃত্যু উপহার দিতে পেরেছেন বলে আনন্দে উল্লসিত হবেন?

['দ্য বুলেটিন অফ দি অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৯৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত ডব্লু. এ. স্মিট. ও পি. বস্‌কুমা'র 'লেসার ফিউসন' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা।]

অভিজিৎ লাহিড়ী
বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

• •

কার্টুন: সৌমেন গুহ

পরিক্রমা

ডাক্তারবাবু কোথায়? ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান কিনা এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। ডাক্তারী ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা ঠিক কি না এ নিয়েও। বিতর্ক চলুক। বলা ভাল। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রামের দিকের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর অবস্থা শোচনীয়। ওষুধপত্র নেই, টাকাপয়সা নেই, এসব মূল সমস্যা ত আছেই, কর্মচারীদের কাজে গাফিলতি ত' আছেই কিন্তু তার সঙ্গে ডাক্তারবাবুরাও নেই। বর্দ্ধমান জেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ডাক্তারদের উপস্থিতি বিরল (স্টেটসম্যান ১৩।৪।৮১)। জলপাইগুড়ির হাসপাতালগুলি ডাক্তার ও নার্সের অভাবে প্রায় অচল। জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে যেসব ডাক্তারদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা নাকি নিয়োগের আদেশ বদল করিয়ে নিয়েছেন (ঐ)। অবশ্য সুযোগ পেলেই বিদেশে পাড়ি দিতে আপত্তি নেই। গত বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা রিপোর্ট থেকে দেখা গিয়েছিল, প্রায় ১৫ হাজার ভারতীয় ডাক্তার বিদেশে আছেন। এটা প্রায় ১৫০ কোটি টাকা পরিমাণ জাতীয় বিনিয়োগের অপচয়। ঐ রিপোর্টে ভারতকে 'ডাক্তার সরবরাহের ব্যাপারে পৃথিবীতে প্রথম' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল (স্টেট্‌সম্যান ৬।৭।৮০)।

ক্যান্‌সার ও 'সিকাফেক': চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্‌সার রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের (CNCRC) অধিকর্ত্রী ও ঐ সংস্থারই এক গবেষক ক্যানসারের এক ওষুধ বার করে ফেলেছেন বলে বেশ কিছুদিন আগে কাগজে খুব প্রচার চালানো হয়েছিল। ওষুধটির নাম 'সিকাফেক'। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা আবিষ্কারটির কথা ঘোষণা করেন। আবিষ্কারটি যে কি ধরনের সে সম্পর্কে জানা যাচ্ছে এখন – CNCRC-র কিছু অভ্যন্তরীণ ঝগড়াঝাঁটি থেকে। ১৯৭৪ সালেই ওষুধটি প্রয়োগ করা হয় চন্দননগরের রূপলাল নন্দী ক্যানসার হাসপাতালের রোগীদের উপর। ঐ হাসপাতালের অধিকর্তা রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি লিখে জানান ওষুধটিতে কোনই ফল হচ্ছে না। সম্প্রতি ওষুধটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 'তৃতীয় পর্যায়'-এ CNCRC-র কুড়ি বিছানার একটি ওয়ার্ডে জরায়ুর ক্যান্‌সারে আক্রান্ত মহিলাদের উপর তাঁদেরকে না জানিয়ে এটি প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আগে জীবজন্তুর উপর যথেষ্ট পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। মানুষের উপর প্রয়োগের সুফল ও কুফল খতিয়ে দেখার জন্য কোন 'এথিকাল কমিটিও' নিয়োগ করা হয় নি (স্টেট্‌সম্যান ১০।৫।৮১)!

অর্থাৎ 'সিকাফেক' এখনো পরীক্ষার স্তরে। আর মানুষের উপর এর প্রয়োগ করা হচ্ছে অবৈধ পদ্ধতিতে।

নাঃ, আমরা বড়ই ছিদ্রান্বেষী হয়ে পড়েছি। একটা মহান আবিষ্কারকে এভাবে ছোট করে দেখা মোটেই উচিৎ নয়!

কে বলে এদেশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ নেই? চণ্ডীগড়ের 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিট্যুট অফ মেডিকাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ' পরিচালিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ, পাঞ্জাব-হরিয়ানার ক্ষেতমজুরদেরকে তাদের মালিকরা আফিমের সঙ্গে আর্সেনিক মিশিয়ে খাওয়ায়। উদ্দেশ্য, মজুরদের কাছ থেকে বেশী কাজ আদায় করা (স্টেট্‌সম্যান, ৯। ।৮১)।

বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু সার্থক প্রয়োগের মত এটির সঙ্গেও অবশ্য কিছু কুফল সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যেমন, খাদ্যনালী, লিভার, হৃদ্‌যন্ত্র ও নার্ভের অসুখ। আর, আর্সেনিক মেশানো আফিমের সঙ্গে যদি মদ থাকে তবে ত কথাই নেই; কুফলের মাত্রা তাতে দাঁড়াবে দ্বিগুণ।

তবে সে যাই হোক, এটা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ নেই যাঁরা বলেন, তাঁরা ভুল বলেন।

ম্যালেরিয়া বাড়ছে: ১৯৭৯ সলে এ রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল, সরকারী হিসেব মতো, ১১ হাজার। ১৯৮০ সালে সংখ্যাটি হয়েছে দ্বিগুণ (স্টেট্‌সম্যান ১২।৬।৮১)।

কুষ্ঠ রোগের সম্ভাব্য প্রতিষেধক টিকে: সারা পৃথিবীতে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক কুষ্ঠ রোগে ভুগছেন বলে জানা আছে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক রোগী ভারতে —৩২ লক্ষ। রোগ ধরা পড়ে নি, অথবা রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলেও ডাক্তারের কাছে যায় নি ঐ রকম রোগীর সংখ্যা কত কে জানে। মোট রোগীর ২৫ শতাংশ হল ১৫ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়ে। কুষ্ঠ রোগ দু' ধরণের হতে পারে—

টিউবারকুলার ও লেপ্রোমাটাস। দ্বিতীয়টি সংক্রামক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা হয় 'ডাপসোন' বা সমধর্মী কোন ওষুধের সাহায্যে। রিফামাইসিন নামক ওষুধটিও এ রোগে বিশেষ ফলপ্রসু। তবে এ পর্যন্ত কুষ্ঠ রোগের কোন প্রতিষেধক টিকে বেরোয় নি। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের 'ইণ্ডিয়ান ক্যানসার রিসার্চ সেণ্টারের' (ICRC) কয়েকজন বিজ্ঞানী দাবী করেছেন যে 'ICRC ব্যাসিলাস' নামক জীবাণু থেকে তাঁরা একটি টিকে তৈরী করেছেন যেটি সংক্রামক ধরনের কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধে সক্ষম (ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এভরিম্যান্স সায়েন্স পত্রিকা, খণ্ড ২৫, সংখ্যা ৬, ১৯৮০-৮১-তে এম জি. দেও-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এঁরা এঁদের গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করছেন। এঁদের বক্তব্য, আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে কুষ্ঠ প্রতিরোধে টিকেটির কার্যকারিতা প্রমাণ করা যাবে। কুষ্ঠ রোগের জীবাণু অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ধরণের ও এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রচুর ব্যবহারিক অসুবিধা আছে। পরীক্ষায় যদি সত্যিই এ টিকের কার্যকারিতা প্রমাণ হয় তবে অন্তত এ দেশের পক্ষে তা হবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শিল্পাঞ্চলের আবর্জনা গ্রামের আবহাওয়াকেও দূষিত করছে: কলকাতা-হাওড়া আর আসানসোল-দুর্গাপুর-বরাকর এই দুটি হল পশ্চিমবাংলার সব চাইতে ঘন শিল্পাঞ্চল। এই দুই অঞ্চলের আবহাওয়া ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত মাত্রায় দূষিত হয়ে পড়েছে। ১৯৭৬ সালে কলকাতা আর হাওড়ার ১০টি কেন্দ্রে সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছিল, বাতাসে ভেসে থাকা আবর্জনার গড় পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ৩৩০ থেকে ৫২৫ মাইক্রোগ্রাম, যেখানে সহনীয় মাত্রা হল ঘনমিটারে ৭৫ মাঃ গ্রাঃ। সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পাঞ্চলের আবর্জনা কেবল শিল্পাঞ্চলের শহরেই নয়, শিল্পাঞ্চল থেকে দূরের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের আবহাওয়া দূষণকে বিপজ্জনক সীমার কাছাকাছি এনে ফেলছে। দুর্গাপুর, দেবগ্রাম, মালদা, ঝাড়গ্রাম ও দীঘা, এই পাঁচটি কেন্দ্রে সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে প্রতিটিতেই ভেসে থাকা আবর্জনার গড় পরিমাণ ঘনমিটারে ৭৫ মাঃ গ্রাঃ এর চাইতে যথেষ্ট বেশী। এর মধ্যে বেশীর ভাগটাই জৈব আবর্জনা, যা একমাত্র শিল্পাঞ্চলগুলি থেকেই আসতে পারে। জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় জমি থেকে হাওয়ায় উড়েও বিভিন্ন জৈব পদার্থ বাতাসে ভাসতে থাকে ও আবহাওয়াকে দূষিত করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এগুলি ছাড়াও সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী, যদিও সহনীয় মাত্রার বেশী নয়। নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড দূষণের মাত্রা আবার শহরের চাইতে গ্রামেই বেশী। এর মূল কারণ গ্রামের জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত সারের ব্যবহার।

অর্থাৎ শুধু শহরেরই নয়, গ্রামের আবহাওয়া দূষণের সমস্যাটিও ভেবে দেখবার মত।

[প্রেসিডেন্সী কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত 'অটাম অ্যানুয়াল', ১৯৮০-৮১তে অধ্যাপক অজিতকুমার সাহার প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।]

"সন্ধানী"

চিঠিপত্র

মহাশয়,

মে-জুন 1981 সংখ্যায় শ্রীসুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের জনস্বাস্থ্য-নীতি ও ডিপ্লোমা মেডিক্যাল কোর্স—একটি মত" শীর্ষক রচনাটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। অনুমান করি, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত আমার ক্ষুদ্র লেখাটির বক্তব্য খণ্ডন করার জন্যই এ রচনার অবতারণা। শ্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন একটি প্রশ্নে—....."আপনি একে (ডিপ্লোমা মেডিক্যাল কোর্স তথা DCMSকে) কি স্টাণ্ট বলবেন না?"

আমি সর্বতোভাবেই স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকাণ্ডের বাইরের একজন সাধারণ বিজ্ঞানকর্মী। তাই এ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য-তত্ত্বের হদিস আমার জানা নেই। তবু শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া তত্ত্ব ও তথ্যের নিরিখে আমি কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারছি না যে DCMS কোর্সটি প্রবর্তনের চেষ্টা একটি স্টাণ্ট মাত্র। কারণ তাঁর নিজের বক্তব্যের মধ্যেই স্ববিরোধী একাধিক সূত্র উপস্থিত। তিনি খুশীমত তাঁর *a priori* ধারণার অনুগামী সিদ্ধান্তটি বেছে নিয়েছেনবলে মনে হচ্ছে। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

(১) রাষ্ট্রীয় বাজেটের শতকরা যত অংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হয়েছে তার হিসাব দিয়ে শ্রী চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে প্রথম পরিকল্পনায় 3.3%. ব্যয় (যা এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম) কমে কমে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় দাঁড়িয়েছে মাত্র 1.9%.। অথচ সামরিক-

খাতে ব্যয় বরাদ্দ তুলনায় অনেক বেশী ; '61-78' এর মধ্যে যার ব্যয় জনস্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের প্রায় 16 গুণ বেশী। এটি ভারতীয় রাষ্ট্রচরিত্রের একটি মৌলিক দিক এবং অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয়।

কিন্তু এ ধরনের পরিসংখ্যান ব্যবহারে অনেক ত্রুটি। শ্রী চট্টোপাধ্যায় পুলিশ-মিলিটারী খাতে ব্যয় বরাদ্দের হিসেব দিয়েছেন কোটি টাকায় (বাজেটের শতকরা অংশ হিসেবে নয়) এবং তাঁরই দেওয়া হিসেব থেকে এটা সহজেই বেরিয়ে আসে যে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনাকালে পুলিশ-মিলিটারী খাতে বরাদ্দ ব্যয় মোট বাজেটের যথাক্রমে 38·/., 36·/. ও 25·/. (প্রায়) (প্রথম দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ পরিকল্পনার তুলনামূলক হিসাব তিনি দেন নি)। সুতরাং তাঁরই যুক্তি অনুসরণ করে, অন্য কোন কমিটি / কমিশনের দোহাই পেড়ে যদি কেউ বলতে চান যে মোট বাজেটের অন্ততঃ 40·/. 'প্রতিরক্ষা' খাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত, অথচ দেখুন, ভারত সরকার ক্রমাগত দ্রুত হারে কিভাবে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়েছেন—তখন তাতেও আমাদের সায় দিতে হয়।

(২) শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হিসেবে (আমার মতে) যা এসেছে তার মূল কথা হল যে আদর্শ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় Health Manpower-এর যে প্রধান তিনটি স্তর—ডাক্তার, সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মী ও অদক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী –তার সংখ্যাগত অনুপাত এমন হওয়া উচিত যে একটি পিরামিডের চূড়ায় যদি হয় ডাক্তারদের অবস্থান, তবে অদক্ষ কর্মীদের অবস্থান পিরামিডের চওড়া ভূমিতে, মাঝের স্তরে থাকবে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী। অথচ ভারতের মত দেশে মধ্যবর্তী স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে এত কম যে ছবিটা পিরামিডের মত না হয়ে বালু-ঘড়ির (Hour-glass) পাত্রটির মত ক্ষীণকোটি। "Text-book of Preventive & Social Medicine"—Park & Park, 8th edition—থেকে শ্রী চট্টোপাধ্যায় এই বক্তব্য হাজির করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এমতাবস্থায় শুধুমাত্র ডাক্তার তৈরী করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা "অবৈজ্ঞানিক" ; বরং, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু ভারতের Health Manpower-এর অন্তর্গত উল্লিখিত তিন স্তরের কর্মীর সংখ্যাগত হিসেব দিলে কি আরও সহজে ও ভালোভাবে বোঝা যেতো না যে ছবিটা কতখানি বালু-ঘড়ির মত ? অবশ্য তেমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে যায় যে ডাক্তারের প্রয়োজন আর নেই ? শ্রী চট্টোপাধ্যায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে "গ্রামে ডাক্তারের সংখ্যা দশ হাজারে একজন কি না সন্দেহ" এবং DCMS ডাক্তাররা MBBS ডাক্তারদের ভাত মেরে দেবে একথা ভাবা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ কিনা, কত ডাক্তারের প্রয়োজন বা আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা সেটা নির্ধারণ করার আগে জনসংখ্যার সঙ্গে ডাক্তারের সংখ্যার অনুপাতটাও বিবেচ্য। তাহলে কি এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় না যে ডাক্তারের প্রয়োজন আরো আছে ঠিকই, কিন্তু উপযুক্ত সুফল পেতে হলে মধ্যবর্তী স্তরের সহায়ক স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা একই সঙ্গে অনেক গুণ বেশী বাড়ানো উচিত যাতে Health Manpower-এর ছবিটা আস্তে আস্তে পিরামিডের আকার নেয় ?

শ্রী চট্টোপাধ্যায় অতি সুন্দরভাবে ভারতের জনস্বাস্থ্য চিত্রের করুণ অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধুমাত্র DCMS কোর্স প্রবর্তন করেই যে মুস্কিল আসান হবে না—তাঁর রচনা এই কথাটিই আমার কাছে স্পষ্টতর করেছে। নমস্কারান্তে—

রবীন মজুমদার
বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গত মার্চ-এপ্রিল '৮১ সংখ্যায় 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' পত্রিকার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ওই পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে একখানা চিঠি আমাদের দপ্তরে এসেছে। দেরীতে পাওয়ায় চিঠিটি এ সংখ্যায় ছাপা গেল না বলে দুঃখিত।

—সম্পাদক

পুস্তক পর্যালোচনা

পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়—জয়ন্ত কুমার বসু, আশা প্রকাশনী
পৃষ্ঠা ১৭০ ; মূল্য : ১৫ টাকা

ডক্টর জয়ন্তকুমার বসু রচিত "পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়" সাধারণের উপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিষয়সূচী নির্বাচন ব্যাপক ও বহুমুখী ; যেমন পদার্থের গঠন, বিপরীত পদার্থ ও বিপরীত জগৎ; অতিপরিবাহিতা, অতিতারল্য, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা—প্লাজমা, সংযোজন চুল্লী, শক্তি সমস্যা ও সমাধান, সংবাদ আদান প্রদানে টেলিভিশন, রেডার, মাইক্রোওয়েভ ও লেসার-এর ভূমিকা, হলোগ্রাফি, কম্প্যুটার তার কার্যপদ্ধতি ও ব্যাপক ব্যবহার, ইলেকট্রনিক্সের লিলিপুট—I. C. (Integrated Circuit), এবং মহাকাশ ও কম্প্যুটার বিজ্ঞানে এদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক—বিশেষ করে চিকিৎসাশাস্ত্রে ইলেক্ট্রনিকস্ ও

কম্প্যুটার-এর অবদান, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি। ঐ সমস্ত বিষয়গুলির অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রভাব ও অবদানের একটি সুন্দর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শুধু বিষয়বস্তু নির্বাচনই নয়, তার পরিবেশনের অভিনবত্ব বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে সমাজের একটা বিবর্তনের দিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জয়ন্তবাবুর লেখার মধ্যে কোনো বিষয়ই হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে আবির্ভূত হয় নি। ইতিহাস ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপস্থাপিত হয়েছে। বেশীর ভাগ উপস্থাপনায় সহজ চিত্র, আলোচনা ও উপমার ব্যবহার বিষয়কে সরস ও প্রাঞ্জল করেছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি (বা বিস্ময়গুলির) পিছনের জটিল তাত্ত্বিক দিকটাও সহজভাবে বলার চেষ্টা হয়েছে। ফলে বিষয়গুলি অনেক প্রাণবন্ত হয়েছে।

গোটা বইটা পড়ে কতকগুলি ছোটখাটো ত্রুটি রয়েছে বলে মনে হয়েছে। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় লেখকের নামের আগে "ডক্টর" উপাধি হয়ত লেখকের পরিচিতির জন্য দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমান লেখক বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে একটি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নতুন করে পরিচিতির প্রশ্ন না থাকায় "ডক্টর" উপাধিটা প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় না দিলেই ভাল দেখাত। অতিতারল্য ও অতিপরিবাহিতা প্রসঙ্গে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম উল্লেখের সময় "অতিবিজ্ঞানী" (২১ পৃষ্ঠা) বিশেষণটা যেন কানে লাগে। অবশ্য 'অতি' উপসর্গটি এখানে আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে MHD Generator-এর বিষয়টি আরেকটু সরলীকরণের দরকার ছিল সাধারণ পাঠকের দিকে তাকিয়ে। ৭২ পৃষ্ঠায় মাইক্রোওয়েভ কেন বেশী সংকেত বহন করতে পারে সেটা বোঝানোর প্রজোজন ছিল। ১১১ পৃষ্ঠায় অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্প্যুটারের মূলগত প্রভেদ আরও সহজ উপমা দিয়ে বললে ভাল হত। ঐ একই পৃষ্ঠায় বন্ধনীর মধ্যে "তেলা মাথাতে……রেওয়াজ নয়?" কথাটা একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। ১১৭ পৃষ্ঠায় "কম্প্যুটার নিপাত যাক" পোস্টার-এর কথাটি সঠিক প্রসঙ্গ ধরে না আসায় সাধারণ পাঠকের খানিকটা বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। সমস্ত দেশেই (বিশেষ করে ভারতবর্ষে) সাধারণ দৈনন্দিন কাজে (বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষ নিপুণ ও নিখুঁত প্রযুক্তি, চিকিৎসা, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্র ছাড়া) কম্প্যুটার (বা Automation) ব্যবহার হলে বেশীর ভাগ শ্রমজীবী অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বেন এবং ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলবে। মুনাফার লোভ শিল্পপতিদের অবশ্যম্ভাবীভাবে উৎসাহিত করবে মানুষের শ্রমের বিকল্প হিসাবে যন্ত্র (বা Automation) চালু করতে। অবশ্য লেখকের সমাজচেতনা প্রকাশ পেয়েছে ১২৬ পৃষ্ঠায় উপসংহারে যেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের যথোচিত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

অনেকদিন ধরেই বিজ্ঞান শিক্ষায় ও জটিল বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় মাতৃভাষার ভূমিকা নিয়ে কূট বিতর্ক তুলেছেন কিছু বুদ্ধিজীবী। জয়ন্ত বাবুর "পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়" বইটিতে আগাগোড়া প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় পদার্থ বিজ্ঞানের জটিল ও অতি সাম্প্রতিক বিষয়বস্তুর যে চমৎকার, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতি লক্ষ্য করা যায় সেটা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ধারণাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল যে, বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (তথা মাতৃভাষা) দুটো ভাল জানা থাকলেই বৈজ্ঞানিক বিষয় অতি সহজেই বাংলায় (তথা মাতৃভাষায়) প্রকাশ করা যায়।

পরিশেষে একটি মন্তব্য রাখতে চাই—সাধারণ পাঠকের (যাঁদের জন্য এই বই লেখা) ক্রয়ক্ষমতার দিকে নজর রেখে বইটির দাম কিছুটা কমালে ভাল হত।

মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়

রিপোর্ট

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭শে মে ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় পৌরোহিত্য করেন সংস্থার সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। সংস্থার বিদায়ী সম্পাদক সৌমেন গুহ বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনে সম্পাদক সংস্থার সাংগঠনিক সমস্যা তুলে ধরে বলেন যে, সক্রিয় কর্মীর একান্ত অভাব, কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়নে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলনে রত আছেন তাঁদের সাথে যোগা-যোগের অভাবে সংগঠনের প্রসার ঘটছে না। বিভিন্ন কর্মী সংস্থার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের শ্রীরামচন্দ্র যাদব সি. এস. আই. আর.-এর অধীন ইনস্টিটিউটগুলির সমস্যাবলী বিশেষ করে বি. আই. টি. এম.-এর অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী তুলে ধরেন। আই. এস. আই.-এর শ্রীসুখ-রঞ্জন ঠাকুর সংগঠনের আমলাতান্ত্রিক সমস্যার দিকটি তুলে ধরেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে সংগঠনের কার্যাবলী ও সার্থকতার দিকগুলি তুলে ধরেন। সভাশেষে ব্রানাওস্কির 'ল্যাডার অফ ক্রিয়েশন' (এ্যাসেন্ট অফ ম্যান নবম অংশ) ছবিটি দেখান হয়। সভায় সংস্থার সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীসুব্রত পাল ও শ্রীজয়ন্ত বসু।

Registration No. R. N. 34929/79 "Registered" Postal Regl. No. WB/CC 113

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' জুলাই ১৯৭৭ থেকে জুন ১৯৮১ পর্যন্ত সংখ্যার প্রধান প্রধান প্রবন্ধাবলীর তালিকা

● জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭৭ : ভারতীয় বিজ্ঞান, নীতি প্রণয়নে ও রূপায়নে—অভিজিৎ লাহিড়ী ও সুব্রত ভট্টাচার্য। ভারতবর্ষ : জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাচিত্র—কে. নাগরাজ ● সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৭ : বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি—বিজয় সরকার। বিশ্ব বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার দাবীসনদ—পুনর্মুদ্রণ ● নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৭ : সি. এস. আই. আর পুনর্গঠন প্রসঙ্গে—সম্পাদক মণ্ডলী। নয়া শিক্ষাব্যবস্থা-নীতিতে ও প্রয়োগে—রবীন মজুমদার ● জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ : বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভূমিকা—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। The Scaffold Called National Science—বিনায়ক দত্তরায় ● মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৮ : বিদেশ থেকে কারিগরি আমদানি : একটি সমীক্ষা—হিরণ্ময় সাহা ও দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী। স্বাধীন ভারতে ঔষধশিল্প ও তার সমস্যা—নীলোৎপল ভট্টাচার্য ● মে-জুন ১৯৭৮ : Repression of Scientists in Argentina—সুনীল মুখার্জী। ভারতবর্ষে ঔষধ শিল্পের গবেষণা—এস. এস. চক্রবর্তী ● জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭৮ : কুষ্ঠরোগ : সমাজ ও বিজ্ঞানের চোখে—রতনলাল ব্রহ্মচারী। Reorientation of Applied Science and Technology—নির্মল চন্দ্র ● সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৮ : Science and Technology in Draft Five Year Plan 1978-83—অভিজিৎ লাহিড়ী। ভারতীয় নৃতত্ত্ব গবেষণা কোন পথে—অমিতাভ বসু ● নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৮ : বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিকতা—প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। রাসায়নিক বিপদ আমদানি—রবীন মজুমদার। পরমাণু শক্তির আসল রূপ—অভিজিৎ লাহিড়ী ● জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ : গাঙ্গেয় অববাহিকায় বন্যা সমস্যা—অমল সোম, পার্থ সেন ও কুমারেশ মিত্র। সিমেন্সের খপ্পরে BHEL—অংশুতোষ খান ● মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৯ : দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—অমল সোম, পার্থ সেন ও কুমারেশ মিত্র। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—শান্তনু দত্ত। Sciece in India—ডি. নারায়ণ ● মে-জুন ১৯৭৯ : ভারতে বর্তমান বিজ্ঞান ও শিল্পসমস্যা—রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। ভারত ভারী বিদ্যুৎ, ভেল—দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী ● জুলাই-আগষ্ট ১৯৭৯ : পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ, অতীত ও বর্তমান—রবীন চক্রবর্তী। গ্রামীন স্বাস্থ্যকর্মী—ডেভিড ওয়ার্নার ● সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৯ : রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধ—পার্থ সেন। 'সল্ট'-২ চুক্তি, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য—দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী ● নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯ : বিজ্ঞান আন্দোলনের সন্ধানে—রবীন মজুমদার। সমাজ ও জীবনবিজ্ঞান—শান্তনু দত্ত ● জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ : বিজ্ঞানের নিক্তিতে অপজ্ঞান—বিদ্যুৎ বিশ্বাস। Problems of Science, Technology and Development in India—সূর্য নিয়োগী। শিশুর শিক্ষা—শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পে আবহাওয়া দূষীকরণ—পার্থ সেন ● মার্চ-এপ্রিল ১৯৮০ : Problems of Science and Development in India (2)—সূর্য নিয়োগী। Energy Strategy—a Critic—ডি. কে. বসু ● মে-জুন ১৯৮০ : ফরাক্কা ব্যারাজ আজ অভিশাপ কেন?—শিবরাম বেরা। Small is Beautiful—রবীন মজুমদার। সাম্মানিক স্তরে রসায়নের পাঠ্যসূচী—পার্থসারথি রায় ● জুলাই-আগষ্ট ১৯৮০ : পেস্টিসাইডের অপপ্রয়োগ ও আমাদের ভবিষ্যৎ (১)—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। শিল্প পরিবেশ ও শ্রমিক স্বাস্থ্য—রবীন চক্রবর্তী ● সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮০ : পেস্টিসাইড (২)—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। দেশী কারিগরির বিকাশ : একটি সমীক্ষা—শুভেন্দু দাশগুপ্ত। ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ খাল বাস্তবসম্মত কি?—শিবরাম বেরা ● নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮০ : হিরোসিমা সংখ্যা—জয়ন্ত বসু, পার্থপ্রতিম মজুমদার, অভিজিৎ লাহিড়ী, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ● জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ : স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী শিক্ষা—রবীন বজুমদার। সাহা ইনস্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স—অভিজিৎ লাহিড়ী। সমস্যা : প্রথম পাঠ—দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী ● মার্চ-এপ্রিল ১৯৮১ : কলকাতায় জলবায়ু দূষণ—কুমারেশ মিত্র। নির্যাতনের বিরুদ্ধে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভূমিকা—সৌমেন গুহ ● মে জুন ১৯৮১ : আই. এ. সি. এস-একটি পর্যালোচনা—অশোক সরকার। জনস্বাস্থ্য নীতি ও ডিপ্লোমা কোর্স—সুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

কিছু কিছু পুরানো সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। আগ্রহী হলে লিখুন। প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশ পয়সা।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও
মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।